OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 452 - 459
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

কামনার কালীদহ ও তারাশঙ্করের কয়েকটি উপন্যাস

ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী
সহকারী অধ্যাপক
শেঠ সুরজমল জালান গার্লস কলেজ
Email ID : pritam22uc@gmail.com

Received Date 20. 12. 2024
Selection Date 01. 02. 2025

Keyword
Tarasankar, Novel, Love, Society, Sexuality, Marginalized people.

Abstract
Tarashankar Bandyopadhyay is a bright star in the post-Rabindra-Sharat Bengali literature in the first half of the 20th century. His name is pronounced along with Bibhutibhushan and Manik. Although Tarashankar is ahead of both of them in terms of composition. However, his longer life than the other two writers can also be identified in this context. Tarashankar is mainly referred to as the commentator of 'Rarhbangla'. He himself was a representative of the evolving feudal society. But he saw all classes of people from landlords to crowd, rich to poor; He understood their life, society, love, relationship, nature and instinct with his heart. The people of Rangamati in Birbhum, Tarashankar's paradise, Came to life in his pen. Tarashankar's literature is a candid picture of marginalized life, Norit is world of hypocrisy of the rich affluent society. Their anger - violence-hatred is as obvious as the expression of sexuality is clear, undisguised. All these become vivid and lively or alive in his work. From Novel 'Ganadevata' Durga, the prostitute, to Padma the housewife--there is an expression of desire in all; Someone is clear in someone's signal-consonant-form. Drunken Aniruddha leaves an unhappy childless marriage and seeks release through sex. Although Chiru Pal wants to be a gentleman, his children bear the mark of his unbridled sexuality. In the novel 'Kobi', Basanta, she too had become accustomed to the indulgent life. She sought to be freed by sheltering Nitai Kabial, but was not saved in the end. Basanta's libertine life had a tragic end in death. In 'Hansuli Banker Upaktha', the Kahar-Kanyas of Banshbadi village leave the house because of desire. They left their sick husband and remarried a man. Due to physical dissatisfaction, Kaloshashi stalks her pre-marriage lover Banwari. Seeing the example of the dead lover, the old Banwari brought the young girl Subasi at home, but could not keep her to herself. In fact, not the house, not the family, not the children, -- girls easily leave the house and run to the new guy. And men's polygamy adultery is in their holes--Banwari, from Param to Karali, no one is satisfied from one woman, mens' instinct of polygamy and adultery has switched from genaration after genaration. In the novel 'Naginikanyar Kahini', the author has highlighted two forms of passion centered on Shabala Pingala. Men who are the head of the Vedic community, how they turn women into

objects of lust is highlighted here. In the novel 'Radha', along with the dialectics of Vaishnava theory, the image of the decadent society of the 18th century has emerged. Although it is not very long, the boy of Vaishnava descent is supposed to run wildly after dark barbarian girls. It is in the context of these few novels that the subject of sexuality has been discussed in the works of Tarashankar.

Discussion

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন —

> “নরনারীর জীবধর্মে প্রেমের দৈহিক সম্পর্কটাই বিশেষভাবে তার কাছে বাস্তব বলে মনে হয়েছিল। তাই তারাশঙ্করের সাহিত্যে নরনারী জীবনধর্ম প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবনধর্মের রূপ নিয়েছে। তারাশঙ্কর মনে করতেন সৌন্দর্যবোধ নয়, নীতির অনুশাসন নয়, ব্যবহারিক জীবনটাই জীবনের ছন্দ, জীবনের প্রত্যক্ষতা জীবনের রসতীর্থে বিচিত্র রসলীলায় তার উপলব্ধি— ভালো মন্দের উর্ধ্বে মানুষ মহৎ হলেও প্রবৃত্তি তার জীবন প্রতিপালনের বিশেষ ধর্ম। একে উপেক্ষা করে জীবনের গতি প্রবাহিত হয় না। কারণ প্রবৃত্তির কাছে মানুষের সমস্ত প্রেয়বোধ বিশৃঙ্খল হয়ে যায়, এই লাইফ ফোর্সকে তিনি সত্য বলে জানতেন তার অভিজ্ঞতা লব্ধ বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে। সুতরাং যুক্তিতর্ক, নীতি, স্নেহ, প্রেম, মমতা, সামাজিক ও প্রাকৃতিক সংস্কার কোন কিছুই অপরিহার্য নয় তার প্রেমধর্মে। তারাশঙ্করের প্রেম ধর্মের মূল সত্য হল আদিম প্রবৃত্তির তাড়না।”[১]

তবে প্রেমের সৃজন শুধু নয়, প্রেমের ধ্বংসেও তো প্রবৃত্তি ভূমিকা নেয়, তারাশঙ্করের সাহিত্যে সে ছবি বিরল নয়। সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের সন্তান হয়ে নিজ সমাজের ‘সম্ভোগ-প্রবৃত্তি’ ও ‘মোহ-মাৎসর্যে’র পাশাপাশি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায়ের জনমানস, তাদের জীবনযাপন, সংস্কার এবং প্রেম ও প্রবৃত্তিকে। অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

> “রাঢ় বাংলার খর-মৃত্তিকাজাত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা— বেদে-কাহার ঝুমুর নাচিয়েরা— তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস তাদের জৈব আসক্তির অনুষঙ্গী জীবনাচরণের আশ্চর্য আদিম মত্ততাকে উন্মোচিত করেছে। প্রেম ও বাসনা, আদিমতা ও লালসার তাড়নায় বিপন্ন কিন্তু অমোঘ এক জীবনবাস্তবতা শিহরিত করেছে পাঠককে।”[২]

তাদের ‘লোভ-লালসা কামনা ও স্নেহ’— সবকিছুই ‘খররৌদ্রের রৌদ্ররসে’ অভিষিক্ত। তাই বেদেনী রাধিকা, সাপুড়ে খোঁড়া শেখ এমন সজীব হয়ে ধরা দেয় তারাশঙ্করের কথাভুবনে। আসলে তারাশঙ্কর আসক্তির দাবদাহ দেখালেও তারই মধ্যে রয়ে যায় আদিম সারল্য। সেই ছবিও ফুটে উঠেছে তার কথা-পরিসরের উপন্যাসমণ্ডলে।

বেশ কিছু ছোটগল্প এবং ‘চৈতালি ঘূর্ণি’, ‘পাষাণপুরী’, ‘প্রেম ও প্রয়োজন’ কিংবা ‘আগুন’-এর মতো উপন্যাস বা রবীন্দ্র-প্রশংসিত ‘রাইকমল’, এসবের পরে 'জীবননাট্যে'র শুরু হিসেবে লেখক নিজেই চিহ্নিত করেছেন সজনীকান্ত দাশ কর্তৃক ‘ধাত্রীদেবতা’র প্রকাশ বা ‘প্রবাসী’তে ‘কালিন্দী’র ধারাবাহিক ছাপা হওয়াকে; এরপরই প্রকাশ পেয়েছে তারাশঙ্করের ‘গণদেবতা’ (১৯৪২)। ‘গণদেবতা’য় পল্লী বাংলার বিবর্তনের ছবি আঁকতে গিয়ে ধরা পড়েছে অদম্য কামনার তীব্র রূপ। উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ছিরু পাল, যৌনব্যাধিতে তার দাঁতেরই শুধু অকাল-পতন ঘটেনি, একের পর এক মৃত অথবা অসুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়ে চলে তার স্ত্রী। পল্লীসমাজের বিবর্তনের ছবি তুলে ধরতে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের অবসান ও ধনতন্ত্রের উত্থানে এই 'হঠাৎ নবাব' হয়ে ওঠা মানুষগুলোর যৌন-জীবন তো এমন বাঁধ ভাঙ্গাই ছিল। মনে পড়বে, ‘যোগাযোগে’র মধুসূদনকে, কুমুদিনীর অর্ঘ্য সে পেতে ব্যর্থ হয়ে লালসা চরিতার্থ করেছিল বিধবা শ্যামাসুন্দরীকে দিয়ে। আর ‘গণদেবতা’য়

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 49
Website: https://tirj.org.in, Page No. 452 - 459
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিরু পাল তো দুর্গার সঙ্গে শুধু 'ফষ্টিনষ্টি' করেই ক্ষান্ত হয়নি, পাতু বায়েন বোনের এই কাজে প্রতিবাদ জানালে, ছিরু পাল 'একগাছা দড়ির বাড়িতে' পাতুর পিঠ ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছিল। আবার একসময় 'বহুভোগ্যা' দুর্গার গৌরদেহ আর উচ্ছ্বসিত যৌবনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ছিরু কামনা করেছে অনিরুদ্ধ কর্মকারের 'দীর্ঘাঙ্গী সবল দেহা' পত্নী পদ্মকে। পদ্ম দেখেছে লোকটির হাসির মধ্যে 'অন্য একটা ক্রূর প্রবৃত্তির প্রেরণা অথবা তাড়নাও ছিল'। যদিও দিনের আলো আর পদ্মর দা'য়ের ভয়ে বেশিদূর এগোতে পারেনি সে। তবে 'অন্তরের নগ্ন কামনার প্রগাঢ় আসক্তি' সহজে সরাতেও পারেনি। তারাচরণ আর দাশজী যখন পদ্ম কে নিয়ে আলোচনা করে তা ভালো লাগে না ছিরুর— 'ওই দীর্ঘাঙ্গি মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচণ্ড— কামনা প্রগাঢ়, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষ নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্ত ভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায়, এক জনশূন্য লোকে— সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মতো; অন্ধকার গুহার নিস্তব্ধতম আবিষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিনীর মতো— শতপাশের বন্ধনের মধ্যে।' এই সাপের অনুষঙ্গে যে অবচেতন যৌন আকাঙ্ক্ষা মিশে থাকে তা ফ্রয়েডের মনোসমীক্ষণ তত্ত্বেও আছে। অন্যদিকে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বিশ্বপ্রিয় মৃধা লিখেছেন—

> "প্রাচীন ভারতীয় সংস্কারে সর্প ও নাগ একার্থবাচক ছিল না। 'নাগ' বলতে বোঝাত গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ এই শ্রেণীর কোন উপজাতিকে, আর 'সর্প' বলতে বোঝাত বিশেষ প্রাণীটিকে। অনুমান করা যায় সাপের ক্রূরতা বিশেষ কোন জাতির মধ্যে অনুরূপ লক্ষণ থাকায় দীর্ঘ অপব্যবহারের ফলে দুটি একার্থবাচক শব্দ হয়ে দাঁড়ায়, যা পরবর্তীকালে নাগ ও সর্প উভয় অর্থেই বিশেষ প্রাণীটিকে বোঝাতে থাকে। সর্প পূজা বা সেই সূত্রে যে সব দেবদেবীর পূজা জড়িত হয়ে আছে, যেখানে আছে ভীতিজনিত কোন বিষয়। কিন্তু সেইসঙ্গে সাপের উর্বরতাবাদ বা fetility cult এর একটি সম্পর্ক আছে একথাও মনে রাখতে হবে। কারণ দেখা যায় অপুত্রক বা বন্ধ্যা নারীগণ সন্তান কামনায় অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে মাটির বা পাথরের তৈরি নাগমূর্তি প্রদক্ষিণ করে প্রার্থনা করে থাকেন।"[৩]

'নারী ও নাগিনী'র জোবেদার মত পদ্মও নিঃসন্তান, সেও গভীর রাতে স্বপ্ন দেখে 'মস্ত বড় একটা কালো কেউটে' তাকে জড়িয়ে ধরছে। পদ্মের অবচেতন অনুভূতিতেও হয়তো মিশে গেছে ছিরুর কামতাড়িত দৃষ্টির বিষ। আর সেই বিষের ক্ষয় যতীন আর উচ্চিংড়ের 'মা-মণি' ডাকে।

অন্যদিকে দুর্গা— সে স্বৈরিণী। তার রূপও তার মায়ের ব্যভিচারের ফসল। তার বৌদি অর্থাৎ পাতুর বউ, সেও গর্ভে ধারণ করেছে হরেন ঘোষালের অবৈধ সন্তান। দুর্গার পারিবারিক প্রেক্ষাপট এমনই। বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গেলে শাশুড়ি তাকে নামাতে চেয়েছিল দেহব্যবসায়। বাপের বাড়ি পালিয়ে এলেও ব্যভিচার থেকে মুক্তি পায়নি; হাতে ধরে মেয়েকে অন্ধকারের পথে এগিয়ে দিয়েছে তার নিজের মা— 'তাহার পর হইতে দুর্গা সেই পথ ধরিয়া চলিয়াছে।' সেই পথে শুধু গ্রামের ছিরু নয়, শিবকালিপুরের বাইরেও তার দেহব্যবসা ছড়িয়েছে। এমনকি যে পাতু বোনের দেহ ব্যবসার প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছিরুর মার খেয়েছিল, সেও বৃত্তি-সংকটে পড়ে রাতের অন্ধকারে বোনকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য পুরুষের ঘরে। আসলে তাদের সমাজে নেই 'আদর্শের সংস্কার', আর দুর্গার 'উৎশৃঙ্খলতা সে সীমাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে! সে দুরন্ত স্বেচ্ছাচারিণী; উর্ধ্বে বা অধঃলোকের কোন সীমাকেই তাহার দ্বিধা নেই।' কিন্তু কাহিনির অগ্রগতির সঙ্গেই দুর্গার অনুভূতিশীল, সজীব, পরোপকারী মনটির পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের হিত সাধনে তার প্রচেষ্টা আন্তরিক। দুর্গার বিলুদিদির বর দেবু পন্ডিত জেলে বসে তা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছে। এই দেবুর প্রতিও দুর্গার ভালোলাগা ছিল। সেখানে কিন্তু কামনার আগুন নেই আছে মহৎ মানুষের প্রতি আন্তরিক ভক্তি। আর 'তেজী লোক' অনিরুদ্ধর প্রতি আছে দেহজ আকর্ষণ— 'সবচেয়ে ভালো লাগে কামারের চেহারাখানি। লম্বা মানুষটি। দেহখানিও যেন পাথর কাটিয়া গড়া, প্রকাণ্ড লোহার হাতুড়িটা লইয়া সে যখন অবলীলাক্রমে লোহার উপর আঘাতের পর আঘাত করিতে থাকে তখন ভয়ে তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে; কিন্তু একটি আঘাতও বেঠিক পড়ে না।' এর মধ্যে যৌনতার সূক্ষ্ম ইঙ্গিত আছে। আর সত্যিই এরপর দুর্গার সঙ্গে অনিরুদ্ধর ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। পদ্মর প্রতি দুর্গার অকপট সহানুভূতি থাকলেও দুর্গার ঘরে অনিরুদ্ধর যাতায়াত ও মদ্যপানে উভয়ের কাম

প্রবৃত্তির স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে— একথা অস্বীকার করা যায় না। আবার অসুস্থ স্ত্রী, সন্তানহীন দাম্পত্য জীবন নিয়ে অনিরুদ্ধর যে মানসিক অশান্তি, নিজের স্বাধীন বৃত্তি নিয়ে গ্রামজীবনে সংকট, সেখান থেকে মুক্তির পেতেই এই কামনা-কালিদহে ডুব দিয়েছিল সে। অন্য মুক্তির পথ অবশ্য খুঁজে পেয়েছিল বটে, তবে সে আরও পরে।

কবি উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে নিতাই কবিয়ালের জীবনকে দেখা; তার জীবনদর্শনের পরিণতি —

'হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?'

কিন্তু 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কান্দ কেনে' থেকে ওই ভাবনায় পৌঁছতে তার জীবনে এসেছে দুই নারী। প্রথমজন নামহীনা ঠাকুরঝি, বন্ধু রাজনের শ্যালিকা— 'মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহ ভঙ্গিতে ভুঁই চাঁপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটি, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটাসুতোর খাটো কাপড়। মোটাসুতোর খাটো কাপড়খানির আটোসাটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানের স্বাভাবিক খাঁজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মতো দেখায়... সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে।' নিতাই কবিয়ালের গান শুনে তার দেহের বসন 'অসম্বৃত' হলেও সে শালীন। কবিয়াল এর প্রতি তার প্রেম কামনা-মদির নয়। কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি রাজনের চোখে আলকাতরা হলেও নিতাই এর চোখে সুন্দর। প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গে মেয়েটির প্রতি মূর্তি ধরা পড়ে কবির চোখে। রাজনের মুখরা স্ত্রী 'রাক্ষসী' ভগ্নিপতির প্রশংসা করলেও রাজনের বক্তব্য থেকে জানা যায় - 'ঠাকুরঝির শাশুড়িটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়।' নিতাইয়ের ঘরে বসন্তের উপস্থিতি দেখে মানসিক স্থিতি হারিয়েছিল সে — পরিবার পরিজনের সঙ্গে ঝগড়া করে মূর্চ্ছা যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত কালী মায়ের ভরণে উঠে দেবাংশীর ঝাঁটার মার খেয়ে নিতাই কবিয়াল এর নাম বলেছিল ঠাকুরঝি। নিতাইয়ের প্রতি প্রেম আর শ্বশুড়বাড়ির অত্যাচার — মৃত্যুই তাকে মুক্তি দিয়েছিল দুটি ক্ষেত্র থেকে।

এরই বিপরীতে বসন্তের অবস্থান, সে রূপসী। ঝুমুরদলে নাচলেও আসলে তো দেহপজীবিনী। একার্থে সে 'নিম্ন শ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা', অশ্লীল নাচগানের সঙ্গে 'রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহব্যবসাও চলে।' রাজবংশী ডোমযুবক নিতাই 'খুনির দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙ্গাড়ের পৌত্র, সিঁধেল চোরের পুত্র' — যার কালো রঙ আর দেহের গঠনে বংশের ছাপ স্পষ্ট হলেও স্বভাবে সে কবি; 'আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা' হয়েও যে স্বর্গে যেতে চায়। সেও ওই রূপোপজীবিনীদের দলেরই গায়ক হয়েছে। বসন্তের সঙ্গে বেঁধেছে গাঁটছড়া। নিতাই কে ভালবাসলেও প্রতি সন্ধ্যায় ভিন্ন পুরুষকে নিয়ে দোরে আগল তোলে বসন্ত। কখনো বসন্তের 'সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে' প্রদর্শিত শরীর দেখে লজ্জিত হয়ে ওঠে নিতাই। ললিতা-নির্মলা বা সব মেয়েদেরই আচার-আচরণে, পোশাকে-আশাকে ছড়িয়ে থাকে যৌন আবেদন— 'মেয়েদের গায়ে গিলটির গয়না, কানঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশনের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশ বিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপ্রকৃষ্ট ভঙ্গী। ঠোঁটে-গালে লাল রঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নোর প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ।' 'আগুনের শীষ' - এর মতো জ্বলছে তাদের শরীর। আবার দেশি মদ খেয়ে সম্ভোগের পর এরাই তো পড়ে থাকে গাছের তলায় তৃণশয্যায়— 'কেশের রাস বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর, মুখের কাছে কতগুলো মাছি ভনভন করিয়া উড়িতেছে।' এই যৌন জীবনকে 'আলোর বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা' বলেই চিহ্নিত করেছেন লেখক— 'মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে।'

এই ঝুমুরের দলে নাচ-গান থাকলেও গভীর সাধনার অবকাশ নেই। শুধু মত্ততায় ডুবে যাওয়াতেই আশ্রয় করে আছে 'জীবনের সকল মর্যাদা'। তাই বাইরে প্রায়-যাযাবর শ্রেণির মেয়েগুলি তো 'নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী' মাত্র— 'তাহাদের দেহ ও রূপের অহংকারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ ও রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়।' এই ব্যবসায় উপার্জনের দু'ভাগ দেহোপজীবিনীর, একভাগ প্রৌঢ়া মাসীর। 'উৎশৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীয় সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি' ধরে মত্ত নিতাই যখন বসন্তের দিকে এগোয়ে 'নিতায়ের মুখ চুমায় চুমায়' ভরিয়ে দেয় বসন্ত। কারণ 'পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি' পেতে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় তাদের— 'পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায়

হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে।' তার ওপর 'কাসরোগ' আড়ালে রেখে চলতে হয় বসন্তকে; কাশির সঙ্গে ওঠে রক্ত, জ্বর আসে প্রায়ই; বুঝতে অসুবিধা হয় না, ক্ষয়রোগে সে জর্জরিতা। 'উলঙ্গবাহার' শাড়ির আড়ালে 'নগ্ননৃত্য' করলেও জীবন তাদের দীর্ঘ নয়। দূর্বা ঘাসের রসে সেই কঠিন রোগ সারে না। তবু সন্ধের পর অশ্লীল কথোপকথনে বসন্ত-ললিতারা নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করে নেয়। বিষাক্ত জীবন থেকে মুক্তি চাইলেও সব পথ তাদের রুদ্ধ।

'বহুভোগের নেশা'ও কিন্তু ছাড়া সহজ নয়। তাই 'সুরুচি সম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে' খদ্দের হিসেবে পেয়ে ফেরাতে পারে না নিতাই-প্রিয়া বসন্ত। সম্ভোগের পর সে আবার অপরাধিনীর মত কেঁদেওছে। এরই মাঝে যৌন রোগে আক্রান্ত হয় বসন্ত। মাসি তিনদিনে সুস্থ হবার আশ্বাস দিলেও দুর্বল মেয়েটির রোগভোগ দীর্ঘকালীন। দেহ জোড়া 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোট'— সোনার অঙ্গ হয়েছে কালিবর্ণ। এভাবেই তো – 'ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।' শুধু বসন্ত নয়, পূর্বে নির্মলা তিনবার ও ললিতা দুবার এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছিল। কারোর 'ভালোবাসার জন' তখন ত্যাগ করে, আবার কেউ 'রোগের সুযোগে তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া পলাইয়া' যায়। নিতাই অবশ্য নিঃস্বার্থ সেবাই করেছিল বসন্তের। মাস পেরিয়ে বসন্ত সুস্থ হলেও সেই 'ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি, তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহ বর্ণের উজ্জ্বলতা লাবণ্য সবকিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।' কঙ্কালসার দেহ থেকে নির্গত হচ্ছে দুর্গন্ধ। না, নিতাই কবিয়ালের প্রেম 'শরতের মেঘ' বা 'হেমন্তের শীতের বাতাসের' মতো চলে যায়নি, শেষ পর্যন্ত থেকেছে। বসন্তের জন্য কলকাতার দোকানে চিঠি পাঠিয়েছে 'সালসা' ওষুধের জন্য। অবশেষে কাটোয়ায় গঙ্গা তীরে দেহ রেখেছে বসন্ত। এই দেহোপজিবিনীর মনেও যে স্বামী পুত্র সংসারের আকাঙ্ক্ষা ছিল তা প্রকাশ করে গিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে এই কামনায় ভরা যৌনতার আতিশয্যময় পরিবেশ আর দেহোপজীবিনী নারীর সংস্পর্শ নিতাইকেও ক্ষণিকের জন্য অন্য মানুষ করে দিয়েছিল। গলায় মদ ঢেলে যখন সে খেউড় গাইতে ওঠে তার রক্তে মস্তিষ্কে জেগে ওঠে 'জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ'— 'সমাজের আবর্জনার স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়ে উঠে রক্তবীজের মতো। ভাষায়-ভাবে-ভঙ্গিতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধেনা।' পড়াশোনা ও কবিয়ালির চর্চা করে নিজের মূলের যে 'আবর্জনা স্তূপ'কে ভুলতে চেয়েছিল তা যেন ফিরে আসে। মত্ততায় ভোগ করে বসন্তকেও— 'সবল বাহুর দোলায় বসন্ত কে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মতো ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি।' এগুলো বসন্তের কাছে 'বহু প্রত্যাশার দিন'। আর এটা ঔপন্যাসিকের বাস্তববোধও বটে।

'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা'য় কাহার কুলের নরনারীর মনে 'অঙ' ধরে। সেই জৈবিকতার প্রকাশও বেশ স্পষ্ট। বলা বাহুল্য জীবনের সাধারণ গতির সঙ্গেই যেন প্রেম-পরকীয়া আর জৈবিকতা মিশে আছে। উপন্যাসের শুরুতেই আছে সাপের অনুষঙ্গ। সেই সাপ মরেছে করালীর হাতে। আর রুগ্ন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত স্বামী নয়নকে ছেড়ে পাখি উঠেছে তারই ঘরে। চন্দনপুরে রেলের কারখানায় কাজ করে করালী। গ্রামের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র সে। কিন্তু পাখির এই প্রেম আর প্রেমের জন্য স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের কাছে যাওয়া কাহারপাড়ায় নতুন নয়। করালীর বিধবা মা-ও তো বাবুর বাড়ির মজুর খাটতে গিয়ে পয়সার লোভে ছেলেকে ছেড়ে গিয়েছিল। সে-জন্যই কাহারপাড়ার নারী আর ভরা কোপাইকে তারাশঙ্কর মিলিয়ে-মিশিয়ে দিয়েছেন — 'কাহারদের এক একটা ঝিউড়ি মেয়ে হঠাৎ যেমন এক-একদিন বাপ-মা-ভাই-ভাজের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে পাড়াপড়শিকে শাপ-শাপান্ত করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, চুল পড়ে এলিয়ে, গায়ের কাপড় যায় খ'সে, চোখে ছোটে আগুন, যে ফিরিয়ে আনতে যায় তাকে ছুঁড়ে মারে ইটপাটকেল পাথর, দিগ্‌বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে চলে কুলে কালি ছিটিয়ে দিয়ে, তেমনি ভাবেই সেদিনই ভরা নদী অকস্মাৎ ভেসে ওঠে।'

কুলে কালি দিয়েছিল কালো বউও — বিয়ের আগে বনওয়ারীর সঙ্গে তার 'রঙ ছুঁই ছুঁই' হয়েছিল। তারপর পরম কাহারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর স্বামী ভিন জাতের মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং বদ সঙ্গে গিয়ে ডাকাতি শুরু করে। সেই অবকাশে 'কালো বউ মনের আক্রোশে চন্দনপুরে রোজ খাটতে গিয়ে নিজেকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগল।' ধরা পড়ে পরমের যখন দ্বীপান্তর হয়, বাবুর বাড়ি চাপরাশি সিংজীর 'অনুগৃহীতা' হয়েছিল কালোশশী। আবার পরম গ্রামে ফিরলে

সে তার দুর্নাম আর কলঙ্ক নিয়ে গ্রামে ফিরেছে। নিজের অসুখী দাম্পত্যের কারণেই হয়তো মাতব্বর বনওয়ারির প্রতি তার আকর্ষণ গেছে আরো বেড়ে। কালোশশী পরমের নামে বহু অভিযোগ জানিয়েছে বনওয়ারীর কাছে, স্বামী স্ত্রীর নিশিযাপনের শীতল মুহূর্তের কথা স্বীকার করেছে। আর পাড়ায় যখন পাখি করালীকে নিয়ে মাতন লেগেছে, মাটির তলায় সাপেরা 'ছ'মেসে দম নিয়ে অসাড়ে ঘুমোচ্ছে', পুরো বোতল পাকি মদ খেয়ে বেহারা পাড়ার মাতব্বর কামনার চোখে দেখেছে আটপৌরে-মাতব্বরের বউ কালোশশীকে— 'কালোবৌয়ের চোখ যেন কোপাই নদীর দহ। তলাতে কিছু যেন খেলা করছে উপরে তার ঝিলিক দেখা যায়, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারা যায় না।' আবার এক মাতন উৎসবে দুই নরনারী মুখোমুখি হল; তার আগেই পরমের সঙ্গে লড়াই হয়েছে বনওয়ারীর। 'মনোরমা' কালোবউ ধুয়ে মুছে দিয়েছে বনওয়ারীর 'ক্ষত এবং আঘাতের যন্ত্রণা'। কোপাইয়ের জলে নেমেছে পুরুষ নারী বসেছে পা ছড়িয়ে বালিতে— 'কোপাইয়ের তরতরে স্রোতের মধ্যে চাঁদ যেন ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে, যেন খিলখিল হেসে ঢলে গড়িয়ে পড়েছে'— তারপরই পরমের উপস্থিতি এবং গোখুরো সাপের কামড়ে পলায়নপরা কালোবউয়ের মৃত্যু। অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— 'ধর্মশাস্ত্র পুরাণ ও লৌকিক ঐতিহ্যে সাপ বরাবর অশুভ শক্তি, গোপন কামনা-বাসনা ইত্যাদির প্রতীক রূপে উল্লেখিত হয়েছে। তারাশঙ্করের গল্প উপন্যাসে কালনাগিনী, নাগকন্যা, যাদু-সাপ ,নাগচক্র প্রভৃতির মোটিফ ও চিত্রগল্প বহুবার বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষত 'নাগিনীকন্যার কাহিনী' ও 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়'।[৪] কালোবউয়ের অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষা যা প্রকাশ পেয়েছিল বনওয়ারীকে কেন্দ্র করে, সাপের কামড়েই যেন তার সমাপ্তি।

কিন্তু 'বনওয়ারীর ঘরে ঢুকেছে কালসাপিনী, সুবাসী কালসাপিনী', — কালোবউয়ের বিধবা বোনঝিকে গোপালীবালার বর্তমানে বিয়ে করেছে বনওয়ারী। কালোশশীকে ভোগের বাসনা তখনও মেটেনি তার। বনওয়ারীর ভালোমানুষ প্রথম পত্নী বোঝে 'কালোশশীর বুনঝি, কালোশশীর মতন দেখতে শুনতে বলে' স্বামী সাঙা করেছে সুবাসীকে। নতুন বউয়ের আলতা লেগে থাকে মাতব্বরের শরীরে। মুখ টিপে হাসে পাড়ার লোক। কিন্তু সুবাসী 'যুবতী মেয়ে, শক্ত শরীর', তাই বনওয়ারী নয় সে আকৃষ্ট হয় করালীর প্রতি। বনওয়ারী সামলে রাখার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় — নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্বে নবীনের জয় তো যুগসত্য। তাই করালীর ছাতিম ফুল ঠাঁই পায় সুবাসীর মাথায়। পাখিকেও করালি স্পষ্ট বলে— 'পোষ মাসে একটা ইঁদুর দশটা বিয়ে করে। আমার এখন বারো মাস পোষ মাস। গ্যাঙের সর্দার আমি। আমি সুবাসীকে নিয়ে এসে সাঙা করব, তাতে তোর ঘর করতে খুশি হয় করবি, না হয় পথ দেখবি।' পাখি ঘর করেনি। করালির কপালে কাটারির আঘাতে 'চিরস্থায়ী দাগ' এঁকে দিয়ে পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নিয়েছে। আর সুবাসী অসুস্থ স্বামী বনওয়ারীকে ফেলে 'নিষ্ঠুর হৃদয়হীন' করালীর ঘরে উঠেছে। প্রশ্ন ওঠে করালীই কি 'শুধু গায়ের জোরে, রক্তের তেজে আর রোজগারের গরমে ধর্মকে পায়ে মাড়িয়ে গেল'! বনওয়ারীও কি যায়নি? মত্ত আবেগে সে-ও এগিয়েছিল কালোশশীর দিকে। আর সুবাসীও তো কালোবউয়েরই উত্তরসূরি— তারা 'যাবেই— এই নিয়ম'। আসলে 'গোপালীবালার মধ্যে কোপাইয়ের ঢেউ নাই, মনে সে দোলা লাগাতে পারে না, সে হল নীলের বাঁধের জল, না আছে সাড়া, না আছে ধরা। চুপচাপ ঠান্ডা শীতল। বুক ডুবিয়ে থাকলে নড়বে না, জড়িয়ে ঘিরে নিথর হয়ে থাকবে...'। কাহার সর্দার তো এমন শান্ত নারী নিয়ে নিয়ে নেশা জামাতে পারেনি। তাই কালোশশী থেকে সুবাসীতে যাত্রা; এর ফল হয়তো ইতিবাচক নয়, কিন্তু সেই সমাজের অনুসারী বটে।

'নাগিনীকন্যার কাহিনী' উপন্যাসে সাঁতালি গ্রামের প্রেক্ষাপটে বিষবেদে সম্প্রদায়ের যাপনে উঠে এসেছে দলপতি শিরবেদের সঙ্গে 'বেদেজাতির ধর্মবোধের প্রতীক নাগিনীকন্যা'র সংঘাত। এই সংঘাতের দুটি ছবি ধরা আছে উপন্যাসে। প্রথম পর্বে মহাদেব ও সবলার দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় পর্বে ধনঞ্জয় ও পিঙলা। ছ'মাস থেকে তিন বছরের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায় বেদেকন্যার; আর পাঁচ বছরের আগে সাপের কামড়ে স্বামীর মৃত্যু হলে সেই মেয়ে হয় নাগিনী কন্যা — 'একজন শিরবেদের আমলে দু-তিনজন নাগিনীকন্যার আসন পার হয়ে যায়।' কিন্তু 'বিষহরি দেবীর কাছে উৎসর্গীকৃত আজীবন কুমারীত্বের ব্রতধারিণী' মেয়েগুলি তো নিষ্কাম হতে পারে না। স্বাভাবিক জৈবিক চাহিদা ফুটে ওঠে তাদের দেহে-মনে। অথচ 'ব্যভিচারের অপরাধ' তাদের স্পর্শ করলে 'গোটা বেদে সমাজের মুখে কালি পড়বে'। অন্যদিকে 'বেদের কন্যের লাজ নাই, শরম নাই, বেদের কন্যের ধর্ম নাই, বেদের কন্যের ঘরের মায়া নাই, বেদের কন্যে বেদেনী অবিশ্বাসিনী।' মনে পড়বে তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পের রাধিকাকে, কেবল শরীরী চাহিদায় এক পুরুষ থেকে যে ছুটে গিয়েছিল অন্য পুরুষের কাছে; ভালোবাসা

নয় এক উত্তপ্ত যৌনজীবনও চেয়েছিল ভীষণভাবে। নাগিনীকন্যা শবলার মনেও এসেছিল 'বয়সের নেশা', কামের চেয়ে গভীর ছিল প্রেম— সেই জোয়ান বেদের প্রতি। ছেলেটির প্রেমেও ছিল একাগ্রতা। শবলা মানসিক-দ্বন্দ্বে দীর্ণ হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মহাদেবের চক্রান্তে রাজগোখরোর কামড়ে প্রাণ গেছে জোয়ান বেদেটির। শবলার শরীর মনে তৃষ্ণা তখনও মেটেনি। তাই 'কচি ধন্বন্তরী' শিবরামের কাছে 'মাতৃকুক্ষীতে সদ্যসমাগত সন্তান-হত্যার ভেষজ চেয়েছে সে'। কারণ তার চোখেও নামে অবাধ্য স্বপ্ন। আসলে 'বেদের মেয়ে মায়াবিনী, বেদের মেয়ে ছলনাময়ী, বেদের মেয়ে সর্বনাশী, বেদের মেয়ে পোড়ারমুখী।' কারণ সে 'সমাজে অবাধ উদ্দাম জীবনলীলা', তারই প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে কামনা জেগেছিল শবলার মনে; শরীরী পিপাসায় দেহে ধরেছিল জ্বালা— 'বুকে আমার সাতটা চিতার আগুন, সর্ব অঙ্গে আমার মরণ জরের তপ'। 'জলচারিণী সরীসৃপ' - এর মতো শিরবেদে মহাদেবের কাছে গিয়ে তার 'কলিজার উপর' বিধে দিল বিষাক্ত কাঁটা। জলে ঝাঁপ দিল শবলা। চল্লিশোর্ধ প্রেয়সী দধিমুখীর বদলে তরুণী শবলা— মহাদেবের কামনাও কি প্রজ্জ্বলিত হয়নি! শবলার যুক্তি— 'শিব নিজে ধরমভেরষ্ট হয়্যা কুচনীপাড়ায় ঘুরে আপন কন্যের রূপে মোহিত হয়।' তাদের 'জৈবিক জীবনের' স্বেচ্ছাচারের আদলে নিজেদের আরাধ্য দেবতাকেও সাজিয়েছে তারা; আর 'ওদের পূজা নিতেই দেবতাটি অম্লান মুখে গ্রহণ করেছে উৎশৃঙ্খলতার অপরাধ, ধরেছেন বর্বর নেশাপরায়ণের রূপ...'। তবে শবলা মুসলমান বেদের সঙ্গে ঘর বাঁধতে গিয়েও সফল হয়নি। মাতৃত্বে ব্যর্থতা হয়েছে অন্তরায়। 'পোড়াকপালী বেদের বেটি', খর চলন-বলন-চাউনি তাদের মাতৃমূর্তি নয়, দিয়েছে এক অভিশপ্ত জীবন। পিপাসার উজানে ভাসলেও 'সর্বনাশীরা ফিরেছে— ধর্ম বিসর্জন দিয়ে। কিছুদিন পরই অঙ্গে দেখা দিয়েছে মাতৃত্বের লক্ষণ। তখন ওই সন্তানকে নষ্ট করতে গিয়ে নিজে মরেছে। কেউ পালাতে চেয়েছে। কেউ পালিয়েছে। কিন্তু পালিয়েও রক্ষা পায়নি তারা। রক্ষা পায় না। হয় মরেছে বেদে সমাজের মন্ত্রপূত বাণের আঘাতে— নয়তো নাগিনীধর্মের অমোঘ নির্দেশে প্রসবের পরই নখ দিয়ে টুঁটি টিপে সন্তানকে হত্যা করেছে। ডিম ফুটে সন্তান বের হবামাত্র নাগিনী সন্তান খায়— নাগিনীকন্যাকেও সেই ধর্ম পালন করতেই হবে।'

হতভাগিনী শবলা পতি পুত্র ঘর না পেলেও প্রাণে বেঁচেছিল, প্রতিবাদিনী হয়েও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিন্তু পরবর্তী নাগিনীকন্যা পিঙলা বাঁচেনি। মহাদেবের পরবর্তী শিরবেদে গঙ্গারামের 'অন্তরের অন্তস্থলে স্বেচ্ছাচারের কামনা কুটিল পথে আত্মপ্রকাশ' করেছিল। সে পাপী ভ্রষ্ট ব্যভিচারী— 'জটিল তার চরিত্র, কুটিল তার প্রকৃতি। সে ডোমন করেত। বেদে পাড়ায় সে অবাধে চালিয়ে চলেছে তার পাপ।' নাগিনীকন্যা পিঙলার উপর পড়েছিল তার কুদৃষ্টি, তাকে আয়ত্ত করতে গঙ্গারামের জটিল পন্থা— 'কন্যাটির মনে সে বিশ্বাস জন্মাতে চেয়েছিল, তার অঙ্গে চাঁপার গন্ধ ওঠে। কল্পনা করেছিল, এই বিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত উদভ্রান্ত হয়ে পিঙলা একদিন রাতে বের হবে, নয়তো পালাতে চাইবে। পালালে এসে তাকে নিয়ে পালাত। মুরশিদাবাদে সে যেত ওষুধের উপকরণ আনতে। সেখান থেকে সে এনেছিল চম্পকগন্ধ, নিত্য মধ্যরাতে সে এসে পিঙলার ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে সেই গন্ধের আরক ছিটিয়ে দিত।' এর পিছনে ছিল শিরবেদের 'মহাপাপের বাসনা'। এই গন্ধের সঙ্গে পিঙলা মিশিয়ে ফেলে মিলন ঋতুতে সাপিনীর অঙ্গের সুবাসকে। মনে পড়বে তারাশঙ্করের 'নারী ও নাগিনী' গল্প—

> "পায়ের কাদা ধুইয়া খোঁড়া ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, গন্ধ কিসের বল দেখি জোবেদা? ... খোঁড়া কথা কহিল না, সে শুধু ঘনঘন শ্বাস টানিয়া গন্ধটার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছিল। এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বিবির ঝাঁপির কাছে দাঁড়াইল। মানুষের পদশব্দে ঝাঁপির ভিতর নাগিনীটা গর্জন করিয়া উঠিল। ...খোঁড়া বলিল, বিবির গায়ের গন্ধ। সাপিনী তো সাপের সঙ্গে দেখা হবার সময় হয়েছে, তাই। ওই গন্ধেই সাপ চলে আসে।"[৫]

আর বিষবেদেদের বিশ্বাস— 'সাঁতালি নাগিনীকন্যের ওই হইল সব্বনাশের হেতু, পরানের ঘরের আগুন। সে আগুন ঘরে লাগলে ঘরের সাথে নিজে পুড়্যা ছারখার হয়্যা যায়। নাগিনীকন্যের অঙ্গে চাঁপার বাস ফুটলে— হয় কন্যে আত্মঘাতী হয়, লয়তো কুলে কালি দিয়্যা বেদেকুলে পাপ চাপায়ে অকূলে ভাসে।' আর সেই উন্মাদরোগে আক্রান্ত পিঙলা, মিথ্যা অপরাধবোধে 'মেয়েটির কষ্টের যে অন্ত নাই, মস্তিষ্ক থেকে হৃদপিণ্ড পর্যন্ত অহরহ এই যন্ত্রণায় নিপীড়িত হচ্ছে।' নাগু ঠাকুর— শবলার অনুরোধে যে তাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল, গঙ্গারাম যাকে বন্দি করেছিল। পিঙলা মানুষটিকে মুক্তি দিলেও থেকে গিয়েছিল

নাগু ঠাকুরের 'মহানাগের ঝাঁপি'। সেই শঙ্খচূড়ের ছোবল নিজের বুকে নিয়ে 'বিশীর্ণা তপস্বিনী' পিঙলা নিজের জীবন যন্ত্রণা জুড়িয়েছে আর 'নিষ্কাম ব্রতে' ঢাকা পড়া অতৃপ্ত কামনা আর জীবন বাসনা থেকে মুক্তি পেয়েছে বিধবা বেদেনীরা।

'রাধা' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে স্বকীয়া ও পরকীয়া— বৈষ্ণব ধর্মের এই দুই তত্ত্বের সংঘাত। এক দিকে প্রেমদাস বাবাজীর আখড়ার রাধামাধব, অন্যদিকে মাধবানন্দের কংসারী কৃষ্ণ। মাধবানন্দ কৃষ্ণভজনা করতে চেয়েছেন রাধাকে বাদ দিয়ে, জয়পুরের স্বকীয় মতে। তিনি 'সারা দেশে পরকীয়া এবং কিশোরী ভজনের পরিণতি'র নেতিবাচক ছবি দেখেছিলেন নিজের পরিবারে। দুই স্ত্রী বর্তমানেও মাধবানন্দের ভোগী জমিদার পিতার 'সুয়োরানী' ছিল এক যবনী-রক্ষিতা। শরিকদের আপত্তিতে তিনি 'গুরু ডেকে তিলক ফোঁটা কেটে মালা পরে নিজে বৈষ্ণব হলেন— সঙ্গে সঙ্গে ওই যবনীটিকে ভেক দিয়ে শুদ্ধ করে নিলেন।' মাধবানন্দ দেখেছিলেন মায়ের যন্ত্রণা, আর সেখান থেকেই তিনি পরকীয়া সাধনার প্রতি ছিলেন বিরূপ। মনে রাখতে হবে উপন্যাসের পটভূমি অষ্টাদশ শতকের প্রথম পর্ব, তখন বাংলার সমাজে ফুটে উঠেছে 'সর্বনাশের সংকেত'— 'জীবনে পচে ধরেছে। একটু অবহিত হলেই তার গন্ধে অন্তরাত্মা শিউরে ওঠে।' বাজারের পাশে 'সাধারণ নটী-কসবিরা মুখে কাপড় দিয়ে হেসে গুপ্ত প্রশ্রয়ের ইঙ্গিত দিয়ে চলে যায়।' অন্যদিকে বৈরাগী-বোষ্টম, ন্যাড়ানেড়ি সম্প্রদায় সেখানেও তো ব্যভিচারের শেষ নেই; প্রেমদাস বাবাজির 'বড় আখড়ার অধিকারিণী' হয়েও কৃষ্ণদাসী 'বৈষ্ণব নটী' — বৈষ্ণবীর সাজে প্রভুর সেবা করে, দেবতার বিগ্রহের সামনে বসে কাঁদে; আবার সে-ই 'সেজেগুজে গায়ে গন্ধ মেখে ডুলি চড়ে দাস-সরকারের কুঞ্জে যায় নটীর মত গান গাইতে। শুধু দাস-সরকার হলেও কথা ছিল না, আরো দু চারজন জমিদার-জোতদারের বাড়ি যায়...।' লেখকের কথায়— 'দুটো জীবন তার যেন দুটো আলাদা ঘরের মত। দুই ঘরের মধ্যে কোন যোগ নেই। অথবা দুটো পাত্রে সে তরল পদার্থের মতো আলাদা আকার ধারণ করে।' আর রাধারমন সরকারের ছেলে অক্রূর ওরফে 'ক্রূর সরকার', তার রূপ তো ভয়ংকর '...সে ধর্ম মানে না; সে বৈষ্ণব বংশের ছেলে হয়েও দুর্দান্ত মাতাল, নারী দেহের প্রতি তার প্রচন্ড প্রলোভন এবং রুচিও বিচিত্র; তার রুচিতে সে নিকষ কালো বন্য বর্বর-জাতীয়া মেয়েদের পিছনে উন্মত্ত লালসায় ছোটে।' তার বিলাসকুঞ্জে 'নিত্য-নতুন শবর জাতীয় যুবতী'দের নিয়ে আসে অনুচরবর্গ। তারই আবার 'ব্যতিক্রমের মতো ভালো লেগেছে মোহিনীকে'— কৃষ্ণদাসীর মেয়ে গোবিন্দমোহিনী। 'শ্বাপদের মতো হিংস্র' বীভৎস অক্রূরের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেও রাধারমণের সাধন কুঞ্জে 'ভজন কুঠুরি'র ডাক অস্বীকার করা দুঃসাহস দেখাতে পারেনা কৃষ্ণদাসী। আর মোহিনী মুগ্ধ মাধবানন্দে। বয়সজনিত মুগ্ধতায় কাম থাকলেও প্রেমের আলোকিত উদ্ভাসন সেখানে অনুপস্থিত ছিল না। শেষ পর্যন্ত তারই মধ্যে স্বকীয়া সাধক মাধবানন্দ দেখেছেন আরাধিকা রাধার রূপ। বহু সংকট সংঘাত এবং প্রতিকূলতা পেরিয়ে 'ক্লেদজ কুসুম' নয় আলোর অমল কমল'-এর মতো 'অমলিন অবারিত সত্য' হয়ে মোহিনী ধরা দিয়েছে মাধবানন্দের চোখে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ, 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথায় কাহার রমণীরা' (প্রবন্ধ), নিমাই দাস, অনিল রায় (সম্পা), 'প্রসঙ্গ হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৭, পৃ. ১১৫

২. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ' (প্রবন্ধ), ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা), 'যুগলবন্দী কথাকার, তারাশঙ্কর মানিক', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত, পরিবর্জিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৪৬

৩. মৃধা, বিশ্বপ্রিয়, 'নারী ও নাগিনী— প্রেমবৃত্তে জীবনায়ণ' (প্রবন্ধ), উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা), 'গল্পচর্চা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৮, পৃ. ১১৩৫ - ১১৩৬

৪. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, 'নারী ও নাগিনী : বাসনার বিষম ত্রিভুজ' (প্রবন্ধ), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৫. ভট্টাচার্য, জগদীশ, (সম্পা), 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৩৬৫, পৃ. ৭২